Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 319 – 326
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

'শীতলক্ষ্যা' : একটি পরিবেশবাদী পাঠ

সুধাময় মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sudhabir94@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Environmentalism, Bengali Novel, Industrialization, Capitalism, Environmental Pollution, Legacy, River Death, Livelihood, Uproot.

Abstract

The geographical space where we live in which surrounds all the living and non-living entity is a very part of our environment. We, the living creatures relatably bound with a perpetual coherence and interdependence with environment. Our earth is beautiful because of its biological diversity. But nowadays this planet is facing various dangerous calamities. It hampers the constituents of the environment every movement, keeping natural balance has become a challenge. This sky-kissing ambitions and unnatural activities on the part of the living beings is responsiable for the degredation of the environment. As a result the glove is facing all the evil consequence caused by the human beings.

Human beings made their appearence in this world as the offspring of the nature. At the very inception of creation, the kind of environment, bestowed upon the hands of human beings by the nature, is gradually facing the fate of suffocating-death as a consequence of this race's immeasurable thurst for pleasure. Specially, the first-world countries are consolidating their pillers of imperialistic-capitalism. As they are prone to overindulgence, the principle of 'throw away culture' has been added to their cherished legacy. In the second half of eighteenth century, Britain saw their industrial revolution and its expension throughout the world, inflicted the tendency of decadence of the nature. At first, the idea of 'Environmentalism' found its voice in the rich countries of first-world in the 70's of last century. The primary objective of this idea is to establish a democratic resistance against the constant exploitation of natural environment and to protect the obvious process of bio-diversity and natural resources. The idea of 'Environmentalism', now defined as 'Ecocriticism' in literature, has now widely been discussed. In Bengali literature, its instances aren't rare either. In my discussion I will illuminate how death of a pre-matuare women named shitolokshya and a river by the same name which describes the destruction of the locate khanepur metaphorically in the novel of 'shitolokshya' (2010) by Haripada Dutta. How the expension of modern high-tech civilization and industrialization affects the conventional native, village culture. How the culture of primitive cultivation and fishing dissolves itself day by day could easily be found at every layer. In

this novel, the proverty striken villagers have been uprooted in the name of industrialization. So the farmers lost their ownland and fishermen lost their right on river that they enjoyed inherently.

Discussion

"পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।"
('সুচেতনা'/ জীবনানন্দ দাশ)

পৃথিবী গোলার্ধে অস্তিত্বশীল স্থাবর-অস্থাবর উপাদান সমন্বয়ে সুসংগঠিত ও বিকশিত আমাদের পরিবেশ। অর্থাৎ আমাদের চারপাশে যা কিছু দৃশ্যমান ও অনুভবযোগ্য - প্রাণী-উদ্ভিদ, লতা-গুল্ম, কীটপতঙ্গ, জল-হাওয়া, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই গড়ে উঠেছে পরিবেশ। পরিবেশগত বৈচিত্র্যে এই পৃথিবী অনিন্দ্য সুন্দর। স্মরণীয় যে, পরিবেশের অন্তর্গত প্রতিটি উপাদান নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হলেও, তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং একটি প্রক্রিয়াগত শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু অধুনা আমাদের এই পৃথিবী এক ভয়ংকর বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছে পরিবেশগত উপাদানগুলি, ছিঁড়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলের স্বাভাবিক সুতো। আর এর মূলে কাজ করছে মানুষের প্রকৃতি বিরোধী কার্যকলাপ, যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী ও ধ্বংসাত্মক। আধুনিক বিশ্বে তাই পরিবেশ ভাবনা ও পরিবেশ বিষয়ক ইস্যুগুলি নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা মাথা ঘামাতে সচেষ্ট হয়েছেন, 'পরিবেশ বাঁচাও' স্লোগানে আন্তর্জাতিক মহল উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

মানুষ জগতের শ্রেষ্ঠ জীব। ধ্যানে জ্ঞানে কর্মে সে জগতের বাকি জীবকুলকে পিছনে ফেলে উন্নতির পরাকাষ্ঠায় আরূঢ়। মানুষের এই অহংসর্বস্ব মনোভাব পরিবেশ সংকটের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে— অন্ততপক্ষে পরিবেশবিদরা সেটাই মনে করেন। কেননা, মানুষ যদি নিজেকে জগতের একমাত্র সত্য ও শ্রেষ্ঠ জীব বলে মনে করে, তাহলে প্রকৃতির স্থান সেখানে কোথায়? প্রকৃতির অস্তিত্বকে সেক্ষেত্রে কি উপেক্ষা করা হচ্ছে না? সভ্যতার বিকাশের যাবতীয় রসদ যেমন মানুষ প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে নিঙড়ে নিচ্ছে, তেমনি মানুষের কি কর্তব্য নয় প্রতিদানে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা? পরিবর্তে বরং আমরা দেখতে পাই, শ্রেষ্ঠ জীব হওয়ার শ্লাঘায় মানুষ প্রকৃতি ও প্রকৃতির যাবতীয় জীবকুলের উপর কীভাবে আধিপত্য বিস্তার করছে, তাকে শোষণ করছে। যার ফলস্বরূপ ভয়াবহ পরিবেশ দূষণ ও বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রকোপ সমগ্র মানবসভ্যতাকে আজ ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করেছে। এ প্রসঙ্গে পরিবেশবিদ জন মুইর-এর বক্তব্য স্মরণযোগ্য–

> "সৃষ্টির এক বিরাট এককের ক্ষুদ্র অংশের চেয়ে নিজেকে কেন মূল্যবান ভাববে মানুষ? যে বিরাট একক অর্থাৎ মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করতে গিয়ে ক্লেশ স্বীকার করেছেন ঈশ্বর তার অন্তর্গত কোন প্রাণীটিই-বা সেই এককের সম্পূর্ণতার জন্য আবশ্যিক নয়? মানুষ ছাড়া মহাবিশ্ব অসম্পূর্ণ থাকবে, কিন্তু ক্ষুদ্রতম সেই আনুবীক্ষণিক প্রাণীটি ছাড়াও মহাবিশ্ব অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে, যে আছে আমাদের অহঙ্কারী চোখ ও জ্ঞানের সীমার বাইরে।"[১]

পরিবেশবাদ, প্রকৃতিবাদ, বাস্তুতন্ত্রবাদ ইত্যাদি অভিধাগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য থাকলেও, উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে এদের সারকথাটি মোটামুটি একই; প্রাকৃতিক পরিবেশের অবদমনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং প্রেম-প্রীতিপূর্ণ মনোভাব নিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র্যের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটিকে বহাল রাখা, যাতে করে অদূর ভবিষ্যতে 'রেড ডাটা বুক'-এর তালিকায় মানব প্রজাতির নামটি না লিপিবদ্ধ হয়। পরিবেশবাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে তাই প্রকৃতি, বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদি শব্দগুলি ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয় প্রকৃতির সন্তানরূপে। সৃষ্টির আদিলগ্নে যে পরিবেশটি প্রকৃতি মানুষের হাতে অর্পণ করেছিল জীবনচর্যার সংস্থান হিসেবে, মানুষ অতিরিক্ত সুখভোগের নেশায় ও দৈনন্দিন আখের গোছাতে গিয়ে তাকে গলা টিপে হত্যা করেছে ক্রমশ। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বের দেশগুলি আর্থ-সামাজিক উন্নতির অজুহাত দেখিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের স্তম্ভকে আরও মজবুত করেছে। অতি ভোগবাদী প্রবণতার কারণে তাদের ঐতিহ্যগত

পরম্পরায় সংযোজিত হয়েছে 'throw away culture'-এর নীতি। কান্ট, হেগেলের মতো বড়ো বড়ো দার্শনিকরাও এই নীতিকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং সভ্যতার শিরদাঁড়াকে সোজা রাখতে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারে মদত জুগিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব এবং গোটা বিশ্ব জুড়ে তার সম্প্রসারণ ও অনুকরণ প্রকৃতির অবমূল্যায়নকে স্ফীত করে তোলে। ইউরো-কেন্দ্রিক অর্থনীতির বিকাশ ও প্রযুক্তিগত বিশ্বায়নের চোরাবালিতে আটকা পড়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিও মেতে উঠেছে প্রকৃতিনিধন যজ্ঞে। উত্তর গোলার্ধের উন্নততর ও দক্ষিণের উন্নয়নশীল দেশগুলির এই শক্তি উন্মত্ততায় ধ্বংস হয়েছে বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক ভারসাম্য। গান্ধিজি বলেছিলেন —

> "প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে পৃথিবী যা দেয় তা পর্যাপ্ত, কিন্তু প্রত্যেকের লালসা মেটাবার জন্য তা পর্যাপ্ত নয় অবশ্যই।"[২]

১৯৭৯ সালের থ্রি মাইলস আইল্যান্ড, ১৯৮৪ সালের ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা, ১৯৮৬ সালের চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি বিপর্যয়গুলি মানুষের এই লাগামছাড়া লালসাবৃত্তিরই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি।

'পরিবেশবাদ' ('Environmentalism') ধারণাটি 'বাদ' ('ism') হিসেবে গত শতকের সত্তরের দশকে প্রথম বিশ্বের ধনাঢ্য দেশগুলিতেই সর্বপ্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিশ্বের যাবতীয় শক্তির আধার হল প্রকৃতি। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ছাড়া কোনো সভ্যতারই বিকাশসাধন সম্ভবপর নয়। তাই যে দেশ যত বেশি ধনী সেই দেশ তত বেশি প্রকৃতির শত্রু, প্রকৃতিহন্তা। বিশ শতকের ষাটের দশকে যে বইটি সমগ্র বিশ্বকে চোখে আঙুল দিয়ে পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা প্রসঙ্গে সচেতন করে তুলেছিল, সেটি হল র‍্যাচেল কারসনের লেখা 'সাইলেন্ট স্প্রিং' (১৯৬২)। ডিডিটি কীটনাশকের প্রতুল ব্যবহার কীভাবে পরিবেশ ও মানবকুলের জিনকে আক্রমণ করে তারই একটি নাতিদীর্ঘ সমালোচনা খাড়া করেছিলেন লেখিকা কাব্যিক ভঙ্গিতে। এছাড়া পল এরলিখের 'পপুলেশন বম্ব' (১৯৬৮), গ্যারেট হার্ডিনের 'ট্র্যাজেডি অফ কমনস' (১৯৬৮), ব্যারি কমনারের 'ক্লোজিং সার্কল' (১৯৭১), ক্লাব অফ রোম-এর প্রতিবেদন 'লিমিটস টু গ্রোথ' (১৯৭২), ই. এফ. শুমাচারের 'স্মল ইজ বিউটিফুল' (১৯৭৩), ব্রান্ডটল্যান্ড কমিশনের প্রতিবেদন 'আওয়ার কমন ফিউচার' (১৯৭৮) ইত্যাদি বইগুলিও পরিবেশবাদ আন্দোলনকে সজাগ করে তুলতে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছে।[৩] ফলত কতকটা লেখাজোখার দ্বারা ভাবিত হয়ে এবং কতকটা দেওয়ালে পিঠ ঠেকে আজকের শিষ্ট সমাজ পরিবেশ বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও সচেতন হতে শুরু করেছে। প্রবর্তিত হয়েছে একের পর এক পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক আইন এবং সংগঠিত হয়েছে আন্দোলন। ১৯৭০ সালে ২২ এপ্রিল আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হয়ে উদ্‌যাপন করে প্রথম পৃথিবী দিবস। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত হয় স্টকহোম সম্মেলন, ১৯৯২ সালে রিও সম্মেলন কিংবা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের মতো একাধিক সম্মেলনে পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক নীতিগুলি আলোচিত হতে থাকে। এছাড়া সত্তর দশক থেকে বিভিন্ন দেশে গ্রিন পার্টির অভ্যুদয় এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড, গ্রিনপিস, ফ্রেন্ডস অফ দি আর্থ-এর মতো নানাবিধ বেসরকারি সংগঠনগুলি প্রকৃতির অবনয়ন রুখতে তৎপর হয়ে ওঠে।

তবে পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক আন্দোলন সর্বাধিক জীবন্ত আকার ধারণ করেছিল দক্ষিণের দেশগুলিতে। এলিট দেশগুলি যেখানে পরিবেশবাদের একটি তাত্ত্বিক দিক খাড়া করেছিল, দক্ষিণের অনুন্নত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা সেখানে নিজেদের জীবনের বিনিময়ে তাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। কেন না সভ্যতার পিলসুজ স্বরূপ এই সমস্ত প্রলেতারিয়েতদের জীবিকা নির্বাহের জন্য অনেকাংশে নির্ভর করতে হত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর। তাই প্রকৃতি ও প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট জীবকুলের সাথে তাদের একধরণের সাহচর্যপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠেছিল। কাঠুরিয়াদের গাছ কাটার বিরুদ্ধে মালেশিয়ায় পেনান জনজাতির বিক্ষোভ, ইউক্যালিপটাস বৃক্ষরোপণের বিরুদ্ধে তাইল্যাণ্ডে চাষিদের অবরোধ, কেনিয়ার গ্রিন বেল্ট মুভমেন্ট, অরণ্যনিধনের প্রতিবাদে ভারতে বিশনই সম্প্রদায়ের চিপকো আন্দোলন কিংবা বাঁধ নির্মাণকে ভিত্তি করে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে আমরা দেখতে পাবো যে, অধিকাংশ পরিবেশবাদী আন্দোলনের সঙ্গেই মহিলাদের একটা অবিচ্ছিন্ন সংযোগ রয়েছে। ওয়াঙ্গারি মাথাই, অমৃতাদেবী, গৌড়া দেবী, মেধা পাটকর প্রমুখ নামগুলি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নারীদের এই সক্রিয় ভূমিকাকে কেন্দ্র করে সত্তরের দশকে পরিবেশ ভাবনার সাথে নারীবাদী তাত্ত্বিকতার ও আন্দোলনের সংযুক্তিকরণ ঘটে, যা 'পরিবেশ-

নারীবাদ' ('Eco-Feminism') নামে পরিচিত। যেখানে পরিবেশ ও নারীর মধ্যে শোষণগত আন্তঃসম্পর্ক নির্মাণ করে, উভয়ের মূল্যহীনতার জন্য দায়ী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রক্ষণশীলতাকে বিদ্রুপ করা হয়েছে।

নিছক নারীবাদী তাত্ত্বিকতার সঙ্গেই নয়, পরিবেশ ভাবনার ধারণাটি সম্প্রতি সাহিত্যের প্রাঙ্গণেও গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে 'ইকোক্রিটিসিজম' পরিভাষা রূপে পরিবেশের রূপায়ণ ও তৎসংক্রান্ত সমস্যাগুলি বেশ সচেতনভাবেই আলোচিত হচ্ছে। বিশ শতকের নব্বই-এর দশকে পরিবেশবাদের একটি সাহিত্যগত সমালোচনার ধারা হিসেবে 'ইকোক্রিটিসিজম' মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

> "Ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical environment."[8]

প্রকৃতি নিছক মানুষের কল্পনা প্রসূত কোনো প্রতিমূর্তি নয়, তারও একটা সক্রিয় ও বাস্তব রূপ রয়েছে। প্রকৃতির এই বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে গড়ে উঠেছে মানুষ-প্রকৃতি আন্তঃসম্পর্ক, যার রূপায়ণ ও প্রসার সাহিত্যিকদের সৃজন কর্মে লক্ষ করা যায়। ইকোক্রিটিকরা সাহিত্যে প্রতিফলিত মানুষ-প্রকৃতির সেই গহীন সম্পর্কটির অনুসন্ধান করেন এবং তার দোষ-গুণের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে থাকেন। অন্যান্য সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যেও তার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নয়। কি চর্যাপদে কি মধ্যযুগীয় কাব্যে প্রকৃতির প্রতি মানুষের ঔদার্যপূর্ণ মনোভাবটিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তৎকালীন কবিরা। আধুনিক সাহিত্যে বিশেষত রবীন্দ্রনাথের কলমে পরিবেশ চিন্তা-চেতনার বিস্তৃত প্রতিফলন ঘটেছে। আমাদের আলোচিতব্য হরিপদ দত্তের 'শীতলক্ষ্যা' (২০১০) উপন্যাসেও প্রকৃতির সাথে মাটি ঘেঁষা মানুষের ঐকান্তিক সম্পর্ক এবং আধুনিক শিল্পায়ন প্রক্রিয়া কীভাবে প্রকৃতির অবমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে একটা জনজাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, সেই আখ্যানই শীতলক্ষ্যা নামক একটি নদী ও একটি নারীর মৃত্যু দ্যোতকে পরিবেশিত হয়েছে।

হরিপদ দত্ত বর্তমান বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক। ১৯৪৭ সালের ২ জানুয়ারি তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের নরসিংদী জেলার খানেপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। প্রভূত গল্প উপন্যাসে তাঁর সাহিত্য সম্ভার অলংকৃত। সম্মানিত হয়েছেন সাদ'ত আলী আকন্দ (২০০১) এবং বাংলা একাডেমী (২০০৬) সাহিত্য পুরস্কারে। শীতলক্ষ্যা মূলত একটি নদীর নাম। জন্মভিটা আর আশৈশব পরিচিত এই নদী থেকে চির জীবনের মতো নির্বাসিত হয়েছেন লেখক। হারানো সেই স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করে আলোচ্য উপন্যাসে আখ্যানের জাল বুনন করেছেন তিনি এক অভিনব আঙ্গিকে।

কাহিনির রয়েছে দুটি পর্ব— গল্প পর্ব এবং উপন্যাস পর্ব। কিছু অনৈক্য সত্ত্বেও গল্প পর্বটি আসলে মূল উপন্যাস পর্বেরই অতিসংক্ষিপ্ত চর্বিতচর্বণ। খানেপুর গ্রামের গা-ঘেঁষে বয়ে গেছে শীতলক্ষ্যা নদী। এই নদীর পদ্মা বা মেঘনার মতো দিগন্ত বিস্তারি রূপ নেই; এই নদী মানুষকে বাউল বানাতে জানে না। এপার থেকে ওপারের মানুষকে সহজেই হাঁক পাড়া যায় এমনই মাঝারি আকার কিন্তু স্বপ্নের নদী শীতলক্ষ্যা। রঙ তার চিতাভস্মের মতো কৃষ্ণবর্ণ। অবিকল একই রূপ নিয়ে বর্ষা-বিক্ষুব্ধ এক অন্ধকার রাতে জেলে পাড়ার পূর্ণচরণ বর্মণের ঘরে ভূমিষ্ঠ হয় কন্যা শীতলক্ষ্যা। নদীর নামেই তার নাম, নদী বর্ণ তার গাত্রে। জেলে পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্ম সুখপ্রদ নয় কখনোই, অন্তত পক্ষে জীবিকাগত দিক থেকে একজন ধীবর পিতার মনে তা ভবিষ্যৎ আশার সঞ্চার করে না। পূর্ণচরণও তাই তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে তার স্ত্রীর প্রতি, 'নির্বংইশা মাগী' বলে গঞ্জনা দিতেও দ্বিধা করে না। তবু দিন গড়াতে থাকে, সময়ের হাত ধরে শীতলক্ষ্যাও বড়ো হয়ে ওঠে; পূর্ণচরণের মানসিকতারও ক্রমশ পরিবর্তন ঘটে। তারপর আচমকা শ্রাবণের এক ত্রিসন্ধ্যায় নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়ে চিরতরে হারিয়ে যায় শীতলক্ষ্যা। তার এই অকস্মাৎ অদৃশ্য ঘটনায় জেলেপাড়ার মানুষজনের মনে এক অজাগতিক বিশ্বাস দানা বাঁধে। তারা ভাবে লক্ষ্যা আদতে এক অলৌকিক জলকন্যা, গহীন গাঙ ছেড়ে ছদ্মবেশে আবির্ভূতা হয়েছিল মায়ের পেটে। মেয়াদ শেষ হওয়ায় সে পুনরায় ফিরে গেছে আপন রাজ্যে। তার মায়ের ধারণা জলের অপদেবতা তাকে টেনে নিয়ে গেছে নদীর অতলে। রহস্য আরও ঘনিয়ে ওঠে যখন লক্ষ্যার পরিপূরক হিসেবে কারখানার সুপারভাইজারেরও হত্যা ঘটে। লেখক অবশ্য জেলেদের বদ্ধমূল সংস্কারের ঘেরাটোপ ডিঙিয়ে এই দুটি হত্যাকাণ্ডের কাল্পনিক অথচ যৌক্তিক বিবরণ দিয়েছেন। লক্ষ্যা আসলে নারীমাংস লোভী

সুপারভাইজারের কামুক দৃষ্টির শিকার হয়। তাকে ধর্ষণ করে বালি চাপা দেওয়া হয় নদী-গর্ভে। প্রেমিক পরমেশ সে কথা জানতে পারে এবং প্রতিহিংসা মেটাতে রামদার আঘাতে সুপারভাইজারের শরীর ফালা ফালা করে দেয়।

যে শীতলক্ষ্যা নদীর তীর বরাবর খানেপুর গ্রাম তার তিন চতুর্থাংশ দখল করে নিয়েছে সার কারখানা। শিল্পায়নের তাগিদে উৎপাটিত করা হয়েছে গ্রামের খেটে খাওয়া অসহায় মানুষগুলোকে। গেলবার যারা ছিল, বছর না ঘুরতেই তাদের বাস্তুভিটেগুলি নিষ্পেষিত হয়েছে বুলডোজারের চাকার তলায়। সরকার বাড়ির রমিজউদ্দিন, দত্ত বাড়ির পারু দত্ত যাদের সাথে পূর্ণচরণের নিয়তই কারবার ছিল তারাও বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়েছে। একদিন জাতের নামে ধর্মের নামে দেশ ভাগ হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ এপার থেকে ওপারে চলে গিয়েছিল। সাতচল্লিশের সেই দেশভাগ ও তার নৃশংস উচ্ছেদীকরণ বিষয়ে পূর্ণচরণ অবগত কিন্তু তার বিস্ময় অন্য জায়গায় —

> "অথচ আজ জাতের নামে নয়, ধর্মের নামে নয়, মানুষ দেশ ছাড়ছে মিল-কারখানার নামে। মানুষকে বাস্তুহারা করছে মানুষ শিল্প-কারখানার নামে, উন্নয়নের নামে। ...হিন্দু মুসলমানের রায়ট নয়, দেশ ভাগাভাগি নয়, তবু মানুষকে মানুষ কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিচ্ছে দেশ আর জন্মভিটা থেকে।"[৫]

শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই মানুষ দেশান্তরি হয় না, সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম হাতিয়ার যে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া তার চাপে পড়েও মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হয়। আসলে অনেক সময় এইসব উচ্ছেদের ইতিহাস দেশভাগ ও দাঙ্গার মতো ততটা সুদূরপ্রসারী বা বৃহত্তর গণআন্দোলনে পর্যবসিত হওয়ার সুযোগ পায় না, তাই তার বিষক্রিয়াতুল্য প্রভাব অনেকাংশে জনমানুষের দীপ্তচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়। কিংবা বিস্তৃত আকার ধারণ করলেও আন্দোলন পরবর্তী যে ভয়াবহ রেশ; যার ভুক্তভোগী শুধুমাত্র স্থানীয় বাসিন্দারা, তা সভ্যসমাজের দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যায়। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর আন্দোলনের (২০০৬-২০১৬) কথা আমরা স্মরণ করতে পারি, যেখানে শিল্পের তাগিদে কয়েকশ একর চাষযোগ্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। ফলত স্থানীয় চাষিরা চরম লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার হয় এবং বাধ্য হয়ে তারা আন্দোলনের পন্থা বেছে নেয়। শেষপর্যন্ত চাপে পড়ে টাটা কোম্পানি শিল্প স্থানান্তর করলেও, বহু আবাদী জমি ইট-পাথরের কংক্রীটে পতিত জমিতে পরিণত হয়। সিঙ্গুরের মতো আমাদের আলোচ্য খানেপুর গ্রামের চাষিরাও শিল্পের মারপ্যাঁচে পড়ে তাদের জমি এমনকি বাস্তুভিটেটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে— হায়িরে ফেলেছে তাদের প্রাণের নদী শীতলক্ষ্যাকে। তবুও এই শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার ভয়াবহ পরিণামী দর্শক হিসেবে টিকে থাকে কেবল জেলেরা। দখলীকৃত হয়নি ঠিকই কিন্তু তাদের জীবনেও নেমে এসেছে অস্তিত্ব সংকটের এক মহাবিপর্যয়।

'দাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে কার্ল মার্কস বলেছিলেন—

> "...যতই না আমরা নিজেদের একটি সমাজ, জাতি বা অস্তিত্বশীল সব সমাজের মিলিত রূপ বলে দাবি করি, আমরা কেউ-ই এই গ্রহের মালিক নই। আমরা শুধু এর ইজারাভোগী এবং ব্যবহারের ভাগীদার। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, আরও উন্নততর অবস্থায় একে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়া।"[৬]

উত্তরাধিকারীদের হাতে অর্থনৈতিক দিক থেকে এক শক্তিশালী সমাজ উপহার দিতে গিয়ে মানুষ পৃথিবী ও প্রকৃতির শোষণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটিকে অব্যাহত রেখেছে। ব্যক্তিস্বার্থ ও মুনাফাবাজের নেশায় মানুষ ভুলে গেছে যে প্রকৃতি তাদের প্রতিস্পর্ধী নয়, বরং মানুষই প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক অলিখিত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। চার্লস ডারউইন তাঁর 'দি ওরিজিন অব স্পিসিস' (১৮৫৯) গ্রন্থে জীবজগতের বিবর্তন প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা বলেছিলেন। প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে লড়াইয়ে যারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে, তারাই এই পৃথিবীর যোগ্যতম উত্তরসূরি হিসেবে টিকে থাকবে। অর্থাৎ প্রকৃতির হাতেই থাকবে নির্বাচনের ক্ষমতা, পৃথিবীর লিগেসি অধিকারের উইলপত্র। কিন্তু কালে কালে মানুষ যখন যাযাবরবৃত্তি পরিহার করে কৃষিকৌশল আয়ত্ত করতে শিখল, তখন থেকেই পৃথিবীর বুকে নিজেদের অস্তিত্বকে আরও স্বচ্ছন্দ ও মজবুত করে তুলতে শুরু করল প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার। ধীরে ধীরে প্রকৃতির হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল মানুষের হাতে, শুরু হল মাত্রাতিরিক্ত পরিবেশ দূষণ। পরিস্থিতির অনিবার্যতায় প্রকৃতিও তাই বাধ্য হয়েছে নিউটনের তৃতীয় নীতির অনুসরণ করতে। মানুষের কৃতকর্মের আঘাত মানবসমাজকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। 'শীতলক্ষ্যা' উপন্যাসেও আমরা লক্ষ করি আধুনিক বিশ্বায়নের অভিশাপে প্রকৃতির অপমৃত্যু কীভাবে

একটি জনপদের বিলয়ের কারণ হয়ে ওঠে। শীতলক্ষ্যার যতদূর দৃষ্টিগোচর হয় তার দুই পাড়ে শুধু ইটভাটা, জুটমিল, বিদ্যুতের কারখানা, আকাশস্পর্শী ইমারত যেন অজগরের মতো গোটা নদীটাকেই আজ গিলে খাচ্ছে। আর এইসব কারখানা নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস ও তরল বর্জ্য আকাশ-বাতাস-নদীর জলকে করে তুলেছে কলুষিত। মাঠ হয়েছে ফসলশূন্য, রাতারাতি ধানের গাছগুলো সবুজ থেকে লালচে রঙ ধারণ করেছে। যেসব সরীসৃপ ও জংলি জন্তুরা এতদিন অবাধে বিচরণ করত তারাও আজ নিরুদ্দেশের যাত্রী। ভেষজ লতা-গুল্মগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। কেঁচো জাতীয় উপকারী প্রাণী ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গগুলো দিনকে দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পাখিরাও হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির বুক থেকে। চিরন্তন ঋতুচক্রের প্রাকৃতিক নিয়মে এক অভাবিত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তাই বসন্তবউড়ি বা কোকিলের ডাকে আর বসন্তের সমাগম ঘটে না। র‍্যাচেল কারসন তাঁর 'সাইলেন্ট স্প্রিং' গ্রন্থে যথার্থই লিখেছিলেন —

> "একদিন আসবে যেদিন বসন্তকে আর ডাক দিয়ে আবাহন করবে না পাখির দল, বসন্তকে বাঙ্ময় করে তুলতে গাইবে না গান। বসন্ত নিস্তব্ধ হয়ে যাবে।"[৭]

শুধু কি তাই! গর্ভবতী মেয়েদের অকাল গর্ভপাত, ক্যান্সারের মতো বীভৎস রোগের উৎস স্রেফ এই প্রাকৃতিক দূষণ। যে শীতলক্ষ্যার জল জেলেদের কাছে সর্বরোগের দাওয়াই (ওষুধ) ছিল, তার জল পানে শুরু হয়েছে কলেরা, মহামারী। একদা হাঁড়ি-পাতিলের নৌকায়, নারকেল বোঝাই পানসিতে শীতলক্ষ্যা নদীর ঘাটগুলি কোলাহল মুখর হয়ে উঠত — আজ সেই ঐতিহ্যও খানেপুর গ্রাম থেকে অপসৃত হয়েছে। জমিগুলি ফসলহীন রুক্ষ প্রান্তরে পরিণত হওয়ায় চাষিরা ঘর ছেড়েছে, নদী মাছশূন্য হওয়ায় জেলেরা তাদের আদি জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আশেপাশের গ্রামগুলি উৎপাটিত হওয়ায় গ্রামে গ্রামে গাওয়াল (শাক-সব্জি, মাছ বা অন্যান্য মনোহারী জাতীয় জিনিস ফেরি করা) করার দিনও শেষ। ৬৮ মাইল দীর্ঘ যে শীতলক্ষ্যা নদী জেলেরা আজ তার মালিকানা হারিয়েছে। তাই মাছ ধরতে এখন জলমহলের ইজারা নিতে হয় সরকারের কাছে। পরম্পরা মেনে জেলেরা জাল পূজা করে ঠিকই —

> "অথচ জলের দেবতা, মাছের দেবতা আর জালের দেবতা নির্বিকার। দিন যত যাচ্ছে জেলেদের কাছ থেকে দেবতা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কুয়াশার ভেতর।"[৮]

আপাত দৃষ্টিতে পরিবেশ ভাবনার উৎস হিসেবে আমরা আধুনিক কালের প্রথম বিশ্বের উন্নততর দেশগুলিকে চিহ্নিত করে থাকি। কিন্তু আমরা যদি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের দিকে ফিরে তাকাই তাহলে উপলব্ধি করতে পারবো যে, কীভাবে প্রাচীন রীতিনীতি, সামাজিক আচার ব্যবহার ও নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সাথে পরিবেশ সচেতনতার স্ফূরণ ঘটেছিল তৎকালীন যুগে। বৈদিক সাহিত্যে চন্দ্র-সূর্য, নদী-জল, পাহাড়-পর্বত, বিভিন্ন উদ্ভিদ, পশু-পাখি ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানগুলির উপর দৈবীশক্তি আরোপ করে তাদের আরাধনার কথা আমরা জানতে পারি। রামায়ণ, মহাভারতেও প্রকৃতির প্রতি মানুষের ঐকান্তিক প্রীতি ও ইতিবাচক মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা নীতির মূলমন্ত্রই ছিল সর্বজীবে প্রেম এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। সেখানে বলা হয়েছে 'পানং ন হানে'- অর্থাৎ কোনো প্রাণীকে অকারণে হত্যা করবে না। অশোকের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ অনুশাসনগুলি থেকে আমরা পরিবেশের প্রতি তাঁর নিজস্ব দায়বদ্ধতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই। পথের দু'পাশে বৃক্ষরোপণ, পান্থশালা ও বিশ্রামাগার নির্মাণ, মানুষ ও পশু-পাখিদের জন্য জলসত্রের ব্যবস্থা ইত্যাদি কর্মসূচিগুলি তাঁর প্রকৃতিনিষ্ঠার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি। এমনকি অবাক হওয়ার বিষয়, যে মনুস্মৃতিকে আমরা সামাজিক আচারসংহিতার কট্টরবাদী সংকলন বলে মনে করি, সেখানেও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতিসাধনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এবং অভিযুক্তদের প্রতি শাস্তি বিধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ ইদানীং সেই প্রাচীন সংস্কৃতির ধারায় ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও মানুষের উচ্চাভিলাষ তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। 'শীতলক্ষ্যা' উপন্যাসেও আমরা সেই ঐতিহ্যের ক্রমভাঙন লক্ষ করি।

সময়ের সাথে সাথে খানেপুর গ্রামের মানচিত্রে আমূল পরিবর্ত ঘটে, বদলে যায় শীতলক্ষ্যা নদীর কিংবদন্তি রূপ। যে নদী ভরা বর্ষায় জেলেদের অসংখ্য ছোট-বড় নৌকায় এক বিচিত্র রূপে সেজে উঠত, নৌকার খোলগুলি ভরে যেত সজীব জীবন্ত মাছে, ভাটিয়ালী সুরে প্রকৃতির মধ্যে গুঞ্জন উঠত, সেই নদী আজ মৃতপ্রায়। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির

দৌলতে মাছেরা অধুনা বন্দিত্ব বরণ করেছে খামারে। পূর্ণচরণকে বিস্মিত করে গড়ে উঠছে ঘোড়াশাল মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র, উপজেলা মৎস্য বিভাগ। হ্যাচারিবদ্ধ মাছেরা হারিয়েছে মুক্ত জীবন, স্বাধীন প্রজনন ক্ষমতা —

> "এ যেনো জেলখানার কয়েদির জীবন। জল নয়, নদী নয়, মানুষই যেনো জন্ম-মৃত্যুর দেবতা।"[৯]

পূর্ণচরণ আরও তাজ্জব বনে যায় যখন সে দেখে দেশি রুই-কাতলা-মৃগেলের পরিবর্তে আফ্রিকান মাগুর, নায়লোটিকা, সিলভার কার্ভ, মানুষখেকো পিরানহা ইত্যাদি বিদেশি মাছে বাজার ছেয়ে গেছে। একদিকে অত্যধিক জনস্ফীতি অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা স্বাভাবিক ভাবেই এই সমস্ত কৃত্রিম মাছের আমদানিকে অপরিহার্য করে তুলেছে। ফলত আধুনিক বিশ্বায়ন ও ভোগবাদিতার এই সর্বগ্রাসী নীতি জেলেদের বাধ্য করেছে স্বাধীন জীবিকার বিকল্প পথের সন্ধানী হতে। জাপানিদের সার কারখানা ও আমেরিকার পিরানহা উভয়ে মিলে শীতলক্ষ্যাকে মাছশূন্য করে জেলেদের হাতে পরিয়ে দিয়েছে গোলামির রশি। কিন্তু পূর্ণচরণ পারেনি আর পাঁচ জনের মতো জাতপেশা ছেড়ে মহাজনের খামারে গিয়ে গোলামি স্বীকার করতে। সে তার পূর্বপুরুষের দেখানো পথের শরিক হয়েই থেকে গেছে— নদীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার অটুট বন্ধনে ছেদ পড়তে দেয়নি। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা) মেহের আলীর মতো মোহাচ্ছন্ন হয়ে সে মাছহীন নদীতে শূন্য নৌকা আর ছেঁড়া জাল নিয়ে ঘুরপাক খেয়েছে অনবরত।

অন্যদিকে পরমেশের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মর্মযন্ত্রণা উপন্যাসের ঘটনাধারাকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে। যে শীতলক্ষ্যা নামের মেয়েটির সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যাকে সে উদাসী জেলে জীবনের দোসর করতে চেয়েছিল, তার সেই স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে সার কারখানার সুপারভাইজারের বন্য রিরংসাবৃত্তি। পরমেশও ক্ষোভ বসত সুপারভাইজারকে খুন করে এবং প্রাণভয়ে নিরুদ্দেশ হয়। সেই পরমেশ আট বছর পর ফিরে এসেছে বাউলবেশে— নদী শীতলক্ষ্যা ও প্রেমিকা শীতলক্ষ্যার স্মৃতি বুকে নিয়ে। উপন্যাসে দুই শীতলক্ষ্যা যেন এক অভিন্ন আত্মায় পরিণত হয়েছে এবং শিল্পায়নের করাল গ্রাসে উভয়েরই অপমৃত্যু ঘটেছে। পরমেশ দেখেছে দুই পাড়ের সারি সারি মিল কারখানা, ইটভাটার চুনকাম করা সাদা কাপড়ে শীতলক্ষ্যার সর্বাঙ্গ যেন আজ আচ্ছাদিত। বিধবা ফুলমালার প্রতি তাই তার বেদনা বিধুর উক্তি—

> "বৌ, চাইয়া দ্যাহ গাঙের দিকে। হ, শীতলক্ষ্যা গাঙও তোমার মতোই বিধবা।...দ্যাহ, তোমার মতই দালান কৌঠার সাদা শাড়ি পইরা আছে এই গাঙ। আমার খুব কষ্ট লাগে বৌ, খুব কষ্ট।"[১০]

যে শীতলক্ষ্যা নদীর অনুগ্রহে নদী তীরবর্তী মানুষগুলোর দিন গুজরান হত, যাকে তারা মাতৃজ্ঞানে সমীহ করত, যার জলে তাদের জন্ম-রক্ত মিশে আছে, সেই শীতলক্ষ্যার বৈধব্যবেশ তাদের অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করে। আমরা জানি যে অরণ্যহানি এবং জমির লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে সিন্ধু, নীলনদ, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস ইত্যাদি নদী অববাহিকায় গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতাগুলি একসময় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর কত নদী বিলীন হয়ে গেছে মরুবালির তলায়, ফসিল হয়ে গেছে কত আদিম প্রজাতি। লেখকের তাই সংশয় —

> "আমাদের শীতলক্ষ্যা কি তেমনি কোনো অরণ্য কিংবা মরুভূমির বদলে ইট-কাঠ-লোহার নগরীর তলায় চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে? চিহ্নহীন হয়ে যাবে কি তার স্রোতের স্মৃতি?"[১১]

উপন্যাসে প্রকৃতি তথা নদী ও নারীর মধ্যে এক অপূর্ব যোগসূত্র রচনা করে লেখক দেখিয়েছেন যে, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার কবলে পড়ে কীভাবে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসভ্যতার বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে; কীভাবে প্রাচীন কৃষিব্যবস্থা ও সনাতন মৎস্য সভ্যতার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। একদা যে শীতলক্ষ্যাকে খুন করে নদীতে বালি চাপা দেওয়া হয়েছিল, যার মৃত্যুশোক পূর্ণচরণ সহ অন্যান্য জেলেদের কাছে স্তিমিত হয়ে এসেছিল, দীর্ঘ কুড়ি বছর পর তার নরকংকাল উদ্ধারের ঘটনা আমাদের সাময়িকভাবে বিস্মিত করে। কিন্তু শীতলক্ষ্যা নাম্নী মেয়েটির নরকংকাল রূপে এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তন আদতে তো একটি মৃতপ্রায় নদীর কংকালসার অবস্থাকেই প্রতীকায়িত করে তোলে। অন্ততপক্ষে লেখকের দৃষ্টি যেন সেই উদ্দেশ্য পূরণের দিকেই। জেলেদের বিশ্বাস অনুযায়ী শীতলক্ষ্যা শুধুমাত্র রক্তমাংসের নারী নয়, সে হচ্ছে জলকন্যা — জলেই তার জন্ম, জলেই মৃত্যু। নদী ও নারীর সাদৃশ্য বোঝাতে এবং ঘটমান নদীমৃত্যুকে ব্যঞ্জিত করতে লক্ষ্যা নামের মেয়েটির নরকংকালরূপী অতীত স্মৃতি আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

পরিবেশবাদ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যিক যে, নিছক প্রকৃতি বা পরিবেশের বর্ণনা থাকলেই তা পরিবেশবাদের বিষয় বলে বিবেচিত হয় না, লেখক যখন সচেতনভাবে প্রকৃতি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির রূপায়ন এবং সমালোচনা করেন তখনই তাকে পরিবেশবাদ অভিধায় ভূষিত করা যেতে পারে। আলোচ্য আখ্যানের শেষে অগ্নিপ্রলয়ের কল্পনা লেখকের সেই সজাগ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক, যেখানে প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্য দিয়ে তিনি আধুনিক শিল্পায়ন ব্যবস্থার ধ্বংসকেই কামনা করেছেন। পূর্ণচরণ তাই জলকন্যারূপী লক্ষ্যার কংকালটি নদীদহে ভাসিয়ে দিতে দিতে কাতর ভাবে উচ্চারণ করেছে —

> "জলকন্যা, যদি তুই হাচাই আমার মাইয়া লক্ষ্যা হইয়া থাকস তবে শীতলক্ষ্যার বেবাক পানি আগুন হইয়া জ্বইলা উঠুক।"[১২]

এই আর্তি শুধু পূর্ণচরণ বা লেখকের একার নয়, এই আর্তি বর্তমান শিল্পায়ন ও নগরায়ন সভ্যতার দূষিত জল-হাওয়ায় হাঁপিয়ে ওঠা প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের। আমাদের ক্লান্ত মন তাই ফিরে যেতে চায় প্রকৃতির সেই আদিম অনাবিল যুগে, মুক্তি পেতে চায় প্রকৃতির নির্জন নিঃসঙ্গতায়। নাগরিক কবি সমর সেনের মতো মহুয়া বনের স্বচ্ছ অমলিন ঘ্রাণ আস্বাদন করে কাতর কণ্ঠে বলতে চাই —

> "আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
> নামুক মহুয়ার গন্ধ।"

Reference :

১. গুহ, রামচন্দ্র, *পরিবেশবাদ : একটি বৈশ্বিক ইতিহাস,* অনু. নীহাররঞ্জন বাগ, কলকাতা, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ২০২২, পৃ. ৯৭

২. তদেব, পৃ. ১২৮

৩. ভুক্ত, অনিন্দ্য, *বিপর্যস্ত পরিবেশ: বিপন্ন বসুধা,* কলকাতা, একুশ শতক, ২০০৯, পৃ. ৬

৪. Glotfelty, Cheryll & Harold, Fromm (Ed). *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology.* Athens: University of Georgia press, 1996, p. xviii

৫. দত্ত, হরিপদ, *শীতলক্ষ্যা,* ঢাকা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ৪৭

৬. দাশ অঞ্জন, অনিরুদ্ধ, *মার্কসীয় পরিবেশভাবনা,* ০৪ আগস্ট, ২০১৯
http://weeklyekota.net/printPaper.php?serial=9066

৭. ভুক্ত, অনিন্দ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৮. দত্ত, হরিপদ, প্রগুক্ত, পৃ. ৪৯

৯. তদেব, পৃ. ৮৯

১০. তদেব, পৃ. ৭৭

১১. তদেব, পৃ. ১০৫

১২. তদেব, পৃ. ১০৯

Bibliography :

আকর গ্রন্থ :

দত্ত, হরিপদ, *শীতলক্ষ্যা,* ঢাকা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১০।

সহায়ক গ্রন্থ :

গুপ্ত, শুভেন্দু, *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা,* কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০১২।

চক্রবর্তী, সুধীর, সম্পাদক, *বুদ্ধিজীবীর নোটবই,* কলকাতা, পুস্তক বিপণি, অগাস্ট ২০২১।

ভুক্ত, অনিন্দ্য, *বিপর্যস্ত পরিবেশ, বিপন্ন বসুধা,* কলকাতা, একুশ শতক, ২০০৯।

মণ্ডল, সুশান্ত, সম্পাদক, *ইকোক্রিটিসিজম ও বাংলা সাহিত্য,* কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, জানুয়ারি ২০২১।